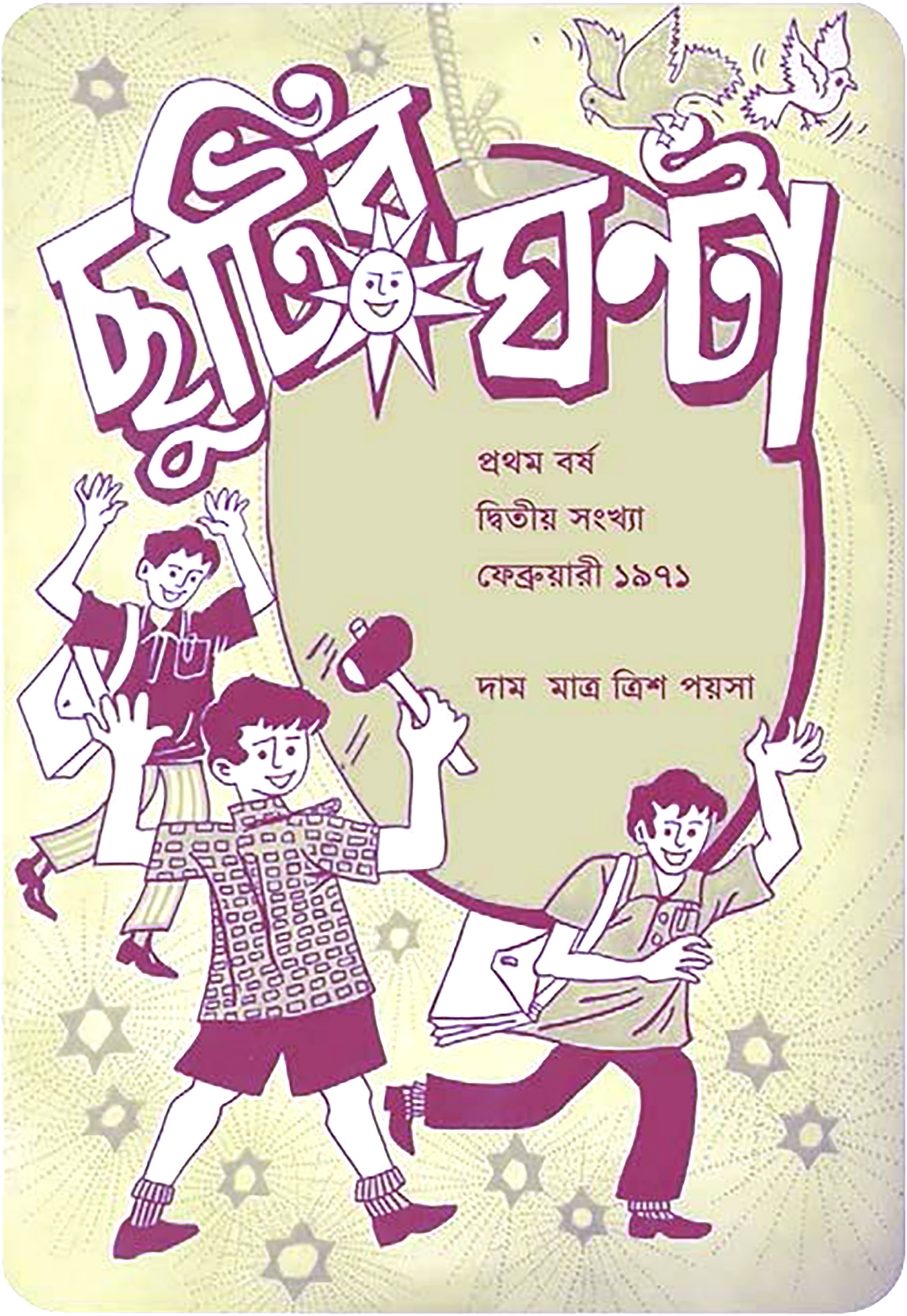

ছুটির ঘণ্টা
প্রথম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ১৯৭১
দাম মাত্র ত্রিশ পয়সা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অর্চন চক্রবর্তী

স্ক্যান ঃ অভিজিত ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছুটির ঘণ্টার ছোট্ট বন্ধুরা

এবারের পত্রিকা যখন তোমাদের হাতে পৌছবে তখন শীত প্রায় শেষ হয়ে গেছে, পৌষের সেই হাড়-কাঁপুনি শিহরণ নেই। পৌষ পার্বণের সেই শীতের রাতের ঠাণ্ডা মধুর পায়েস-পিঠার আনন্দ শেষ। তারপর শিশির-ভেজা ঘাস পেরিয়ে মুঠো-মুঠো গাঁদাফুল দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজার অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেল। শীত শেষ, শীতের উৎসবও শেষ।

তাকিয়ে দেখ গাছে গাছে নতুন কচি পাতা বসন্তের আসার পথ চেয়ে উৎসুক হয়ে আনন্দে কাঁপছে। বাতাস কত উতল, আকাশ কত নীল। সেখানে আকাশে বাতাসে যেন ছুটির ঘণ্টা আনন্দ ছড়িয়ে বেজে চলেছে।

ছুটির ঘণ্টা

বিমল দত্ত

যে জন ঘণ্টা বাজায় ছুটির,
স্কুলের ধারেই তাহার কুটির ;
তাকে আমি চিনি, তুমি চেনো, চেনে সুবোধ, সুধীর।
তাকে সবাই ভাল বাসে
সে যে মাঠের ঘাসে ঘাসে
ছড়িয়ে রাখে আমোদ খুশি অবাধ ছুটোছুটির।
আরো অনেক আছেন যাঁরা,
ছুটির ঘণ্টা বাজান তাঁরা—
কেউ বসে বাজান বাঁশি,
ছড়ান পুলক রাশি-রাশি—
রূপকথা কন তেপান্তরের, জাদুকরের রুটির—
রুটি যখনই কেউ খায়
অমনি ছাগল হয়ে যায় ;
জাদুকরের ভেঁপু বাজে, ঘণ্টা যেন ছুটির।
ছুটির ঘণ্টা বাজে—ঢং,
আকাশ- ভরা কতই—রং ;
শিশুর চোখে রংমশালের হাজার হাজার রং !
ছুটির ঘণ্টা বাজে—ঢং।





কৈ কে কাশির অবাক কাণ্ড!

শিবরাম চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দাদার সমর্থন আসে, 'আহা মরি মরি!'

—'থেকে আরম্ভ করে সেদিনের নীহার গুপ্ত, গৌরাঙ্গ বোস অব্দি সব আমার পড়া। ব্লেক সিরিজ, মোহন সিরিজ বিলকুল। জয়ন্ত কুমার থেকে ব্যোমকেশ পর্যন্ত কারো কীর্তি-কলাপ আমার অজানা নয়। এত পড়ে পড়ে আমি নিজেই এখন আস্ত একটা ডিটেকটিভ, তা জানেন?'

'বলো কী হে?'

'সেবারকার আমাদের কারখানায় চুরিটা ধরল কে শুনি? কোন্ গোয়েন্দা? এই শর্মাই তো! তেজপাতার টোপ ফেলে তৈজসপত্রের লোভ দেখিয়ে আমিই তো ধরলাম চোরটাকে! দাদার বেবাক টাকা উদ্ধার করে দিলাম। তাই না দাদা?'

'তোর ওইসব বই-টই এক-আধটু আমিও যে পড়িনি তা নয়। তোর বই-টই অবসর মতন আমিও ঘেঁটে দেখেছি বইকি! তবে পড়ে-টড়ে যা টের পেয়েছি তার মোদ্দা কথাটা এই যে, গোয়েন্দাদের মৃত্যু নেই। তারা আপনার মতই অজর অমর অবিনশ্বর অকাট্য অবিদ্ধ……'

'অকাট্য? অবিদ্ধ?'

'হ্যাঁ ; তরোয়ালে কেটে ফেলা যায় না, গুলি দিয়ে বিদ্ধ করা যায় না—মেরে ফেলা তো অসম্ভব। কানের পাশ দিয়ে চলে যাবে যতো গুলি গোলা। এই পরিচ্ছেদে দেখলেন আপনি যে হতভাগা খতম হল, আবার পরের পরিচ্ছেদেই দেখুন ফের বেঁচে উঠেছে আবার। অকাট্য অবিদ্ধ অখাদ্য।'

'তাহলে চলো দাদা! আমরাও ওকে টের পেতে না দিয়ে ওই ট্রেনে চলে যাই আজ। গুলি না করেও গুলিয়ে দেওয়া যাক ওকে—আসল জায়গার থেকে ভুলিয়ে অন্য জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসব দেখো তুমি।'

এতক্ষণে দাদা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন মনে হল। হাসিমুখে বললেন—'যাব তো, কিন্তু যাচ্ছি যে, ও যেন টের না পায়।......'

গৌহাটি স্টেশনে নামতেই তাঁরা নজরে পড়ে গেলেন কঙ্কেকাশির। কঙ্কেকাশি তাঁদের দেখতে পেয়েছেন সেটা তাঁরা লক্ষ্য করলেন বটে, কিন্তু তাঁরা যে লক্ষীভূত হয়েছেন সেটা তাঁকে টের পেতে দিলেন না একেবারেই। নজরই দিলেন না একদম তাঁর দিকে। আপন-মনে হেলে দুলে বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলেন তাঁরা।

কঙ্কেকাশিও অলক্ষ্যে পিছু-পিছু আরেকটা ট্যাক্সিতে উঠলেন গিয়ে। ছুটলেন তাঁদের পিছনে পিছনে।

হর্ষবর্ধনের গাড়ি কিন্তু কোন জঙ্গলের ত্রিসীমানায় গেল না। তাদের বাড়ির চৌহদ্দির দিকে তো নয়ই। অনেক দূরে এগিয়ে একটা ছোটখাট পাহাড়ের তলায় গিয়ে খাড়া হল গাড়িটা।

ভাইকে নিয়ে নামলেন হর্ষবর্ধন। ভাড়া মিটিয়ে বকসিস দিয়ে ছেড়ে দিলেন ট্যাক্সিটা।

কঙ্কেকাশিও নেমে পড়ে পাহাড়ের পথ ধরে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগলেন ওঁদের।

আড়চোখে পিছনে তাকিয়ে দাদা বললেন ভাইকে—'ছায়ার মত আসছে, খবরদার ফিরে তাকাসনে যেন!'

'পাগল হয়েছ দাদা ? তাকাই আর তাক পেয়ে যাক !' দাদার মতন গোবরারও আজ নয়া চেহারা 'হুভায়ে এখানেই আজ ওকে নিকেশ করে যাব। কাক-চিল কেউ টের পাবে না, সাক্ষী থাকবে না কেউ। শকুনি গৃধিনীতে খেয়ে শেষ করে দেবে কালকে।'

'কাজটা খুবই খারাপ ভাই সত্যি বলছি!' দাদার অনুযোগ : 'কিন্তু কী করা যায় বল ? ও বেঁচে থাকতে আমাদের বাঁচন নেই, আর আমাদের বেঁচে থাকাটাই যখন বেশি দরকার, অন্তত আমাদের কাছে······তখন ওকে নিয়ে কী করা যায় বল ? তবে ওকে আদৌ মারা যাবে কি না সন্দেহ আছে। এখনো পর্যন্ত একটা গোয়েন্দাও মরেনি কখনো।'

'কিন্তু বাবার যেমন বাবা আছে, তেমনি গোয়েন্দার ওপরেও গোয়েন্দা থাকে'······জানায় গোবরা—'আর তিনি হচ্ছেন খোদ এই গোবর্ধন ! খোদার ওপর খোদকারি হবে আমার।' রবার্ট ব্লেকের স্মিথের মতই গোবরা দাদাকে নিজের সাকরেদ বানাতে চাইলেও হর্ষবর্ধন অন্য রূপে প্রকট হন, গোঁফ মুচড়ে বলেন—'তুই যদি গোবর্ধন, তাহলে আমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং গোবর্ধনকে ধারণ করে রয়েছি !'

বলে ভাইয়ের হাত ধরে তিনি বলেন—'আয়, আমরা এই উঁচু ঢিবিটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। একটুখানি গা-ঢাকা দিই। লোকটা এখানে এসে আমাদের দেখতে পেয়ে কী করে দেখা যাক—'

কল্কেকাশি বরাবর চলে এসে কাউকে না দেখে সোজা পাহাড়ের খাড়া দিকটার কিনারায় গিয়ে পৌঁছন। দেখেন যে তার ওপারে আর পথ নেই —অতল খাদ, তাঁর খাদ্যরা বিলকুল গায়েব। তাকিয়ে দেখেন চারদিকে— দুই ভাই কারোরই পাত্তা নেই—গেল কোথায় তারা ?

এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়েই তারা দেখা দিল হঠাৎ।

কল্কেকাশি সাড়া পেলেন পেছন থেকে—'হাত তুলে দাঁড়ান !'

ফিরে তাকিয়ে দ্যাখেন দুই মূর্তিমান দাঁড়িয়ে—যুগপৎ শ্রীহর্ষ এবং শ্রীমান গোবর—বর্ধন ভ্রাতৃদ্বয়। দুজনের হাতেই পিস্তল।

(চলবে)

তিমি-র কথা

অলক সেন



এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রাণীর জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল তিমি। ডাইনোসর, ইক্‌থিওসর, ইগুয়ানোডন, এমনকি সুবৃহৎ ব্রন্টোসরাসও আকারে তিমির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। একটা বড়-সড় তিমি-র দৈর্ঘ্য যতটা, আমাদের দেশের দশটা হাতি একটার উপর একটা দাঁড়ালেও তার সমান হবে না—যদিও হাতিদের ওভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা কেউ কখনো করেছেন বলে আমার জানা নেই। বড় বড় তিমিদের পঞ্চাশ ফুট, এমনকি তার চেয়েও বেশি লম্বা হতে দেখা গেছে। আর সবচেয়ে বড় তিমি, যাকে বলা হয় ব্লু হোয়েল, তার দৈর্ঘ্য হয় নব্বই থেকে একশো ফুট পর্যন্ত, আর ওজন একশো কুড়ি থেকে দেড়শো টন। অর্থাৎ প্রায় দু-হাজার মানুষের, বা ত্রিশটা হাতির ওজনের সমান।

তিমি জলের প্রাণী হলে কী হয়, তারা মাছ নয় কিন্তু। তারা স্তন্যপায়ী, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা কুকুর, সিংহ, বাঘ, গরু, মানুষ প্রভৃতির সমগোত্রীয়। এবং জলের প্রাণী হলেও তাদের নিশ্বাস নেবার প্রয়োজন হয়। আর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত কিন্তু তিমি রোমশ নয়, তবে, সামান্য দু-একটা রোঁয়া যা তাদের আছে তা থেকে আন্দাজ করা যায় যে তাদের পূর্বপুরুষরা রোমশ প্রাণীই ছিল।

তিমি-র পূর্বপুরুষদের কবে বা কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানীরা তা সঠিক করে বলতে পারেন না। তবে, অন্তত যে ছ-কোটি বছর আগে,

তাতে সন্দেহ নেই। এখন যে জায়গাকে অ্যালাবামা বলা হয়, কোটি কোটি বছর আগে তার বেশিরভাগটাই ছিল সমুদ্রের তলায়। এটা জানা যায় অ্যালাবামার পাথরের মধ্যে পাওয়া হাড় থেকে। সে হাড় প্রায় সত্তর ফুট লম্বা তিমিজাতীয় কোন সরু, দাঁতাল প্রাণীর। আকৃতিতে কতকটা সামুদ্রিক সাপের মত হলেও এই হাড় থেকে তাকে এ যুগের তিমি-র সমগোত্রীয় বলে বোঝা যায়। বর্তমানের সমস্ত তিমি-র ও তিমি-গোত্রীয় প্রাণীর পূর্বপুরুষ এ।

এক সময়ে সমস্ত সমুদ্রেই তিমি থাকত, কিন্তু আজকাল আর প্রশান্ত মহাসাগর এবং সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগর ছাড়া তাদের অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না।

তিমিদের মসৃণ শরীর জলে বাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এত বড় প্রাণী যখন, তোমরা ভাবছ যে তিমি-র হাড় নিশ্চয় নিরেট শক্ত। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। তাদের হাড় নরম, যেজন্যে তাদের চলাফেরায় কোন অসুবিধে হয় না এবং যেজন্যে আকৃতির অনুপাতে তাদের শক্তি অনেকটা অল্প। তারা থাকে জলের নিরাপত্তায়, যেজন্যে স্থলচর কোন প্রাণীর মত শক্ত হাড়ের তাদের দরকার হয় না।

তিমি-র নিশ্বাস নেবার জন্যে বাতাসের দরকার, এইজন্যে তাকে মাঝে মাঝে জলের উপর ভেসে উঠতে হয়। সাধারণত তারা এক নাগাড়ে দশ পনেরো মিনিটের মত জলের তলায় থাকে; তবে, প্রয়োজন হলে, অর্থাৎ ভয় পেলে কিংবা আহত হলে তারা এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় নিশ্বাস না নিয়ে জলের তলায় থাকতে পারে। তারা নিশ্বাস ত্যাগ করে নাসারন্ধ্র দিয়ে,—এই রন্ধ্র থাকে তাদের মাথার উপর। তিমি-র পেটের ভিতরের গরম বাতাসটা জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত হয়; তাই যখন সে নিশ্বাস ত্যাগ করে, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে তা মেঘের মত হয়ে উঠে। শীতের দিনে তোমরা যখন নিশ্বাস ফেল তখন যেমনটা হয় আর কি। তিমি-র এই নিশ্বাস জলের উপর অনেকটা উঁচু হয়ে ওঠে, দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা ফোয়ারা। বহুদিন পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল

যে তিমি মুখ দিয়ে জল নেয় আর তা নাসারন্ধ্র দিয়ে পিচকারির মত ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু তিমির জীবনধারা ভাল করে পরীক্ষা করবার পর এই ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে।

তিমি জলের উপর ভেসে উঠলে তিমি-শিকারীরা বুঝতে পারে সে কোন্ জাতের তিমি। এক-এক রকম তিমি এক-এক রকম ভাবে নিশ্বাস ফেলে : রাইট হোয়েলের আর স্পার্ম হোয়েলের নিশ্বাস ফেলার ভঙ্গি আলাদা ; আবার ফিন্‌ব্যাক হোয়েলের ভঙ্গিও অন্যরকম। আবার বিরাট ব্লু হোয়েল যখন গভীর জল থেকে উঠে এসে নিশ্বাস ফেলে তখন যে স্তম্ভের সৃষ্টি হয় তা জলের উপর প্রায় কুড়ি ফুট পর্যন্ত উঠে থাকে।

ডুবুরির-পোশাক-পরা মানুষ ৪৪০ ফুট পর্যন্ত সমুদ্রের নিচে নেমেছে। কিন্তু ৩০০ ফুট নিচেও কাজ করা ডুবুরির পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে তাকে জলের উপর তুলতে হয়। এবং তুলতে হয় আস্তে আস্তে—কারণ হঠাৎ অত নিচে থেকে উপরে তুললে জলের চাপ সহ্য হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ তিমিই শত-শত ফুট নিচে নেমে যায়, কখনও বা তারও বেশি। স্পার্ম হোয়েলের বিরাট শরীরের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে এই জলের চাপ তখন হয়ত এক হাজার পাউণ্ডেরও বেশি হয়ে পড়ে। অথচ তবুও এতে তার কোন ক্ষতি হয় না, কারণ জলের নিচে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের দরকার হয় না ; তার রক্তে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে তা এই জলের তলায় স্থিতির পক্ষে যথেষ্ট।

তারা যা খায় আর যেভাবে তা খায় তাই দিয়ে বিচার করে তিমিদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় জাতের দাঁতাল তিমি-র খাদ্য হল মাছ আর বড়-বড় জলজন্তু। দাঁতও আবার সব তিমি-র সমান নয়। কোন-কোন তিমি-র দুটোর বেশি দাঁত হয় না, কোন-কোন তিমি-র আবার পঞ্চাশটা বা তারও বেশি দাঁত থাকে। দাঁতাল তিমি-র মাথার উপর দুটো নাসারন্ধ্রের বদলে একটা মাত্র নিশ্বাস প্রশ্বাসের গর্ত থাকে।

স্পার্ম হোয়েলের বিশাল মাথার উপরে সাদাটে মোমের মত এক বস্তুর এক বিশাল চৌবাচ্চা-গোছের থাকে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগের যুগে এ বস্তু বাতির কাজে ব্যবহৃত হত ; এ বাতিতে ধোঁয়া হত না। তার থেকে

যে তেল তৈরি হত তা দিয়েও আলো জ্বালার কাজ চলত। এখন তা ব্যবহৃত হয় মুখে মাখার ক্রীম, বা রান্না, বা বিস্ফোরক তৈরির কাজে।

প্রায় আধ টন ওজনের স্কুইড বা অন্যান্য বিশালকায় প্রাণী স্পার্ম হোয়েল এক দিনে খেতে পারে। এই খাদ্য যখন তার সহ্য হয় না তখন একরকমের পুরু ধূসর রঙের তেলতেলে বস্তু তার অন্ত্রে তৈরি হয়। শিকার-করা কোন-কোন স্পার্ম হোয়েলের মধ্যে কখনও-কখনও এই বস্তু দেখা গেছে। একে বলে অ্যাম্বারগ্রিস,—এর ওজন কখনও কখনও কয়েক পাউণ্ড পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এ বস্তু কখনও কখনও সমুদ্রের জলে ভাসতে দেখা গেছে। অ্যাম্বারগ্রিসের গুণ হল, সুগন্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী করা। এই অ্যাম্বারগ্রিস অত্যন্ত দামি, এর একটা বড় খণ্ড পেলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর তিমি সংখ্যায় অল্প হলেও আকৃতিতে অনেক বড়। এদের দাঁত থাকে না। বড় বড় তিমিরা বেশিরভাগই এই শ্রেণীর। এদের প্রত্যেকের দুটো করে নাসারন্ধ্র, আর প্রকাণ্ড এদের মুখ,—স্পার্ম হোয়েলের চেয়েও বড়। এই শ্রেণীতে পড়ে ব্লু হোয়েল, রাইট হোয়েল, গ্রে হোয়েল, ফিনব্যাক, হাম্পব্যাক আর বো-হেড হোয়েল।

তিমিরা বেশির ভাগই সামাজিক প্রাণী,—দল বেঁধে একসঙ্গে ঘোরে ফেরে। শীতকালে কিংবা বসন্তের প্রথম দিকে তারা জোড় বাঁধে। সেই সময়ে তারা কখনও কখনও জল থেকে উপরে পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে। তিমি-র বাচ্চা দশ মাস বা বারো মাস মায়ের পেটে থাকে। জন্মের সময় তার দৈর্ঘ্য হয় পনেরো ফুটের মত, আর ওজন হয় প্রায় এক টন। আর ব্লু হোয়েলের বাচ্চার দৈর্ঘ্য হয় জন্মের সময় পঁচিশ ফুট, আর ওজন বেশ কয়েক টনের মত। ওদের মধ্যে যমজ বড়-একটা দেখা যায় না।

তিমি-র মা বাচ্চাকে ভালবাসে, তাকে আদর করে, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। অন্যান্য স্তন্যপদের মত তিমিও স্তন্যপান করে। তার মা তখন পাশ ফিরে শোয়। তার দুটো স্তন থাকে। বাচ্চার স্তন্যপানের ধরন ঠিক কুকুরছানা বা বেড়ালছানার মত। সাত মাস থেকে এক বছর মা সন্তানের লালন-পালন করে। এই সময়ে তার বৃদ্ধি বেশ দ্রুত হতে থাকে।

এক বছরে তারা দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, আর পূর্ণগঠিত হয়ে ওঠে তিন বছরের মধ্যেই। ব্লু হোয়েল এক বছরে প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। কোন-কোন তিমি মাত্র আট বছর বা দশ বছর বাঁচে, কোন-কোন তিমির আয়ু আবার হয় তার দ্বিগুণ পর্যন্ত।

এত বিরাট যে প্রাণী তার আর শত্রু কোথা থেকে হবে, তাই না? কিন্তু বড়-বড় তিমিদের শত্রু হল ছোট মাপের আর-এক ধরনের তিমি, যার নাম কিলার (খুনে) তিমি। এরা মাত্র কুড়ি ফুট লম্বা; এরা চলা-ফেরা ও শিকার করে দল বেঁধে। সবচেয়ে প্রকাণ্ড যে তিমি তাকেও এরা আক্রমণ করতে ভয় করে না। কিন্তু বড় বড় তিমিদের মানুষ যা অনিষ্ট করে সে তুলনায় এ কিছুই নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ তিমি শিকার করে আসছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তিমি শিকার একটা বড় ব্যবসায় ছিল। নিউ বেডফোর্ড এবং অন্যান্য বন্দরে তিমি-শিকারীরা দীর্ঘ দিনের জন্যে তিমি অভিযানে যেত। হারপুন দিয়ে তিমি শিকার করা যেমন কঠিন তেমনি বিপদের কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা হলেও প্রতি বছরই ক্রমেই বেশি সংখ্যায় তিমি শিকার করা হয়ে আসছিল।

আজকাল তিমি-র সন্ধানে প্রশান্ত ও কুমেরু সাগরে শিকারের যে বিরাট বন্দোবস্ত হয়েছে তাকে এক-একটা ভাসমান কারখানা বলা চলে। প্রত্যেক জাহাজে থাকে ছোট-ছোট নৌকো, হারপুনের কামান থাকে তাতে। এই মারাত্মক অস্ত্রের সঙ্গে লড়াইয়ে তিমি-র জয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প,—ফলে শিকারীরা যে-সব তিমি-র পিছু নেয় তাদের রক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

এর ফলে যখন দেখা গেল যে তিমি-র সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, তখন পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো ঠিক করল এর একটা বিহিত করতে হবে। ফলে কোন-কোন অঞ্চলে তিমি শিকার বে-আইনি বলে ঘোষিত হল। কিন্তু এই আইন সত্ত্বেও তিমি-র সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। বিজ্ঞানীদের মত হল, তিমিদের রক্ষার ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি আইন না করলে হয়ত পৃথিবীর এই বৃহত্তম প্রাণী কোনদিন অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়বে।

ছেলেটি বেড়াল আঁকত



ল্যাফক্যাডিও হার্ন

অনেক দিন আগেকার কথা। জাপানের এক ছোট্ট গ্রামে বাস করত এক গরিব চাষী আর তার বউ। বড় ভাল লোক ছিল তারা। তাদের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের খেতে দেওয়াই ছিল তার পক্ষে এক সমস্যা। সবচেয়ে বড় ছেলেটি বেশ শক্তসমর্থ, চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সে তার বাপের সঙ্গে কাজে যাচ্ছে, আর ছোট মেয়েরা যখন থেকে হাঁটতে শিখেছে তখন থেকেই তাদের মাকে কাজে-কর্মে সাহায্য করে আসছে।

কিন্তু সবচেয়ে ছোট যে ছেলে সে কোন শক্ত কাজের যোগ্য হল না। ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলে কী হয়, সে ছিল যেমন দুর্বল তেমনি ছোটখাট; লোকে বলত বড় হয়ে সে বিশেষ কাজের লোক হবে না। তাই তার বাবা মা ঠিক করল কোন ভারি কাজে না লাগিয়ে তাকে মন্দিরের কাজে লাগাবে। এই ভেবে সে একদিন ছেলেটিকে নিয়ে গ্রামের মন্দিরে গেল। প্রধান পুরোহিতকে গিয়ে ধরল, যদি তিনি দয়া করে তাকে মন্দিরের কোন কাজে নেন।

পুরোহিত মশায় ছেলেটির সঙ্গে খুব মিষ্টি করে কথা কইলেন, আর

খুব কঠিন কঠিন কয়েকটা প্রশ্ন তাকে করলেন। ছেলেটি সে-সব প্রশ্নের এত চমৎকার উত্তর দিল যে পুরোহিত খুব খুশি মনেই তাকে গ্রহণ করলেন।

ছেলেটি বেশ তাড়াতাড়িই শিখতে লাগল। পুরোহিত মশায়ের ভারি বাধ্য ছিল সে, কিন্তু একটা বড় দোষ তার ছিল। সে বেড়ালের ছবি আঁকতে খুব ভালবাসত; এমনকি পড়ার সময়েও সে বসে বসে বেড়ালের ছবি আঁকত। এমন অনেক জায়গায় সে বেড়ালের ছবি আঁকত যেখানে বেড়ালের ছবি কোনমতেই থাকা উচিত নয়।

যখনই সে একা থাকত, বেড়াল আঁকত। পুরোহিত মশায়ের খাতার পাতার ধারে ধারে যে জায়গা ছিল সেখানে আঁকত, মন্দিরের যেখানে জায়গা পেত সেখানে আঁকত, দেওয়ালে আঁকত, থামে আঁকত। পুরোহিত কতবার তাকে বারণ করলেন, কিন্তু তবুও সে কিছুতেই বেড়াল আঁকা বন্ধ করল না। কেমন যেন একটা নেশা চেপে গিয়েছিল, বেড়াল না এঁকে কিছুতেই সে থাকতে পারত না। ছবি আঁকার ব্যাপারে তার প্রতিভা ছিল, আর ঠিক সেই কারণেই, দেখা যাচ্ছে যে, সে ঠিক মন্দিরের কাজের উপযোগী নয়। কারণ মন্দিরের কাজ ভাল করে শিখতে হলে পড়াশুনোর দরকার।

একটা কাগজে বেড়ালের অনেকগুলো চমৎকার চমৎকার ছবি দেখে একদিন পুরোহিত মশায় খুব রেগে গিয়ে তাকে বললেন, 'দেখ বাপু, এক্ষুনি তোমায় এ মন্দির ছেড়ে চলে যেতে হবে। মন্দিরের কাজ কোন-দিনই তুমি ভাল করে শিখতে পারবে না। কিন্তু শিল্পী হিসেবে হয়ত তুমি খুব নাম করতে পারবে। আমার এই শেষ উপদেশটা সব সময়ে মনে রেখো,—বড় বড় জায়গায় কক্ষনো থাকবে না, ছোট ছোট জায়গায় থাকবে।'

'বড় বড় জায়গায় থাকবে না' বলে উনি কী বলতে চান ছেলেটি ঠিক বুঝল না। জামাকাপড় গুছিয়ে নিতে নিতে সে অনেক চিন্তা করল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ পুরোহিত মশায়কে যে জিজ্ঞাসা করবে সে সাহসও তার হল না। তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

খুব মন খারাপ করে ছেলেটি চলেছে। কিন্তু ভেবে পাচ্ছে না কোথায় যাবে, কী করবে। সোজা যদি বাড়ি যায় তাহলে বাপ নিশ্চয় তাকে শাস্তি দেবে, সেই ভয়ে সে বাড়ি ফিরবে না ঠিক করল। হঠাৎ তার মনে পড়ল

পাশের গ্রামে একটা বড় মন্দির আছে, সেখানে শুনেছে অনেক পুরোহিত আছেন। সে ঠিক করল সেখানে গিয়ে কাজের চেষ্টা করবে।

কিন্তু মন্দিরটা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ছেলেটি তা জানত না। এক বিকট দৈত্যের ভয়ে পুরোহিতরা সবাই সে মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কয়েক জন বীর সৈন্য সেই দৈত্যকে বধ করতে গিয়েছিল, কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। কিন্তু এসব কথা তো ছেলেটিকে কেউ বলে নি, তাই সে গেল সেই গ্রামে।

যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, লোকজন সবাই শুয়ে পড়েছে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে বড় মন্দিরটা তার চোখে পড়ল, দেখল সেখানে একটা বাতি জ্বলছে। লোকে বলে ও বাতি নাকি জ্বালে দৈত্যটা, যাতে আশ্রয়ের আশায় কোন মানুষ যায় সেখানে। সেখানে গিয়ে সে দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আরও কয়েক বার কড়া নাড়ল, কিন্তু তবুও কেউ এল না। শেষ পর্যন্ত আস্তে দরজাটা ঠেলতেই সে বুঝল, দরজা বন্ধ নয়। তখন সে ভিতরে গেল। দেখল, একটা দীপ জ্বলছে, কিন্তু কোন পুরোহিত বা জনমানুষ নেই।

ভাবল নিশ্চয় কোন পুরোহিত এখুনি এসে যাবেন, তাই সে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। লক্ষ্য করল, মন্দিরের সর্বত্র প্রচুর ধুলো আর ময়লা আর মাকড়সার জাল। এ দেখে তার মনে হল নিশ্চয় সে এখানে মন্দিরের কাজের চাকরিটা পেয়ে যাবে। সে ভেবে পেল না কেন জায়গাটা এমন নোংরা। তবে একটা জিনিস যা তার খুব ভাল লাগল তা হল, এখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় পরদা আছে, দিব্যি বেড়ালের ছবি আঁকা যাবে। একটা লেখবার ডেস্কও সে দেখতে পেল। তারপর আর কী, খানিকটা কালি বানিয়ে নিয়ে সে মহা উৎসাহে বেড়াল আঁকতে শুরু করল।

অনেকগুলো বেড়ালের ছবি সে আঁকল। তারপর তার খুব ঘুম পেল, দু-চোখ ঘুমে জুড়ে এল। ওখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে নেবে মনে করছে, এমন সময় তার হঠাৎ পুরোহিত মশায়ের কথাটা মনে পড়ে গেল,—'বড় বড় জায়গায় কখনো থাকবে না'।

মস্ত বড় মন্দিরটা, অথচ সে একেবারে একা। পুরোহিতের কথাটা

মনে পড়তে, যদিও সে তার কোন অর্থই বুঝতে পারে নি, এই প্রথম তার একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। সে ঠিক করল এখানে নয়, একটা ছোটখাট ঘর দেখে সেখানে শুয়ে ঘুমোবে। হঠাৎ পাশেই একটা ছোট ঘর তার চোখে পড়ল। সেই ঘরে গিয়ে সে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। যেমন শোওয়া, অমনি অঘোরে ঘুম।

তখন অনেক রাত, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল—লড়াই, আর চিৎকারের শব্দ। সে শব্দ এমন ভয়ঙ্কর যে মাঝের দরজাটার ফাঁক দিয়ে দেখতেও তার ভরসা হল না। নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে পড়ে রইল,—নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে ভয় করছে। মন্দিরের বাতিটা এক সময় নিবে গেল, কিন্তু সে শব্দ কমা দূরের কথা, ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে, সমস্ত মন্দিরটা কাঁপছে থর-থর করে। অনেকক্ষণ এভাবে চলবার পর এক সময় গোলমাল থেমে গেল। কিন্তু তখনও তার নড়াচড়া করতে সাহস হল না। দরজার ফাঁক দিয়ে যখন আলোর রেখা দেখা দিল তখন সে সাহস করে উঠল।

যেখানে শুয়ে ছিল খুব সন্তর্পণে সেখান থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটি। তাকিয়ে দেখল চারদিকে। দেখে, মন্দিরের মেঝেতে একটা বিরাট দৈত্যাকার ইঁদুর মরে পড়ে আছে। বিরাট তার চেহারা, একটা গরুর চেয়েও অনেক বড়। ঝকমকে যুদ্ধের পোশাক তার পরনে। ওঃ, কী ভীষণ মূর্তি! এর ভয়ে যে পুরোহিতরা পালাবেন এবং এর কাছে যে যোদ্ধারা হেরে যাবে এ আর আশ্চর্য কী! কিন্তু যাই হোক, এ আর নড়বে না, সত্যি-সত্যিই মরে গেছে।

কিন্তু কার হাতে, কিংবা কিসে সে মরেছে? কোন মানুষ, বা কোন প্রাণীই তো দেখা যাচ্ছে না! হঠাৎ তার চোখে পড়ল, যেসব বেড়ালের ছবি সে এঁকেছিল সবগুলোর মুখই টকটকে লাল। তাই দেখে সে বুঝল, তার আঁকা বেড়ালগুলোই ওকে মেরে ফেলেছে। আর এতক্ষণে সে বুঝল কেন পুরোহিত তাকে বড় জায়গায় না থেকে ছোট জায়গায় থাকতে বলেছিলেন।

বড় হয়ে ছেলেটি শিল্পী হিসেবে খুব নাম করেছিল। যেসব বেড়াল সে এঁকেছিল সেগুলোর কয়েকটা আজও দর্শকদের দেখানো হয়ে থাকে।

জাতক-কথা

ব্যোমকাকা

ব্যোমকাকা আসতেই হুলো আর টুনটুন্ জিজ্ঞেস করল

'ব্যোমকাকা, বোধিসত্ত্ব মানে বুঝি বুদ্ধদেব?'

'না, বুদ্ধ নয়। বুদ্ধ হওয়ার জন্য বা যিনি বুদ্ধ হবেন তাঁকে কয়েক কোটিবার নানা প্রাণীরূপে জন্ম নিতে ও একটু একটু করে জ্ঞান লাভ করতে হয়। অবশেষে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করে তিনি জন্মান বুদ্ধরূপে। বুদ্ধরূপে জন্মানোর আগের ওই জন্মগুলিকে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব অবস্থা বলে।' বললেন ব্যোমকাকা।

'বোধিসত্ত্বের অনেক গল্প আছে, না?' টুনটুন্ জানতে চাইল।

'হুঁ। সে সব কাহিনীর নাম কী জানিস?'

ঘাড় নেড়ে টুনটুন্ জানালো, 'না।'

'সেগুলির নাম জাতক।'

হুলো অমনি ধরে বসল জাতকের একটি গল্প বলার জন্য।

একটু ভেবে নিয়ে ব্যোমকাকা বললেন : শোন্—

একসময়ে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন।। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহরূপে জন্মেছিলেন। বোধিসত্ত্ব-সিংহ একটি পাহাড়ের কাঞ্চন নামে এক গুহায় বাস করতেন। গুহাটি ছিল পাহাড়ের এক কিনারায়। নিচেই তার একটা খোলা জায়গা, আর তারই গায়ে বন। বন থেকে বেরিয়ে নানা জন্তু জানোয়ার সেই খোলা জায়গাটায় বেড়াতে আসে। আর সিংহমশায় তাদের এক একটাকে মেরে নিজের খাওয়া দাওয়া সারেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব-সিংহ একটা মোষের মাংস খেয়ে নিজের গুহার দিকে যাচ্ছেন, এমন সময়ে এক শেয়াল তাঁর সামনে পড়ে গেল।

পালাবার পথ না থাকায় ও সিংহের হাতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে শেয়াল পশুরাজের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

বোধিসত্ত্ব-সিংহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'কী হে, তুমি কী চাও?'

শেয়াল বলল : 'আমি আপনার দাস হতে চাই। আপনার সেবা করে জীবন কাটাতে চাই।'

বোধিসত্ত্ব-সিংহ খুশি হয়ে বললেন : 'বেশ, চল আমার সঙ্গে।' শেয়ালকে নিয়ে তিনি তাঁর কাঞ্চন-গুহায় গেলেন।

শেয়ালের সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে, বোধিসত্ত্ব যা যা শিকার করে খাবেন তা থেকে কিছু কিছু মাংস শেয়ালকে দেবেন। বোধিসত্ত্ব যখন গুহায় শুয়ে থাকবেন তখন শেয়াল পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখবে নিচের সেই খোলা মাঠটায় কোনও জন্তু আসছে কি না। হাতি, ঘোড়া, বুনো মোষ, শুয়োর যাই আসুক না কেন যদি তার মাংস খেতে শেয়ালের ইচ্ছে হয় তো সে গুহার দরজায় এসে সিংহকে নমস্কার করে বলবে—'বিরোচ সামি!' (তার মানে, প্রভু, আপনি তেজ দেখান!)

শেয়াল তখন থেকে তাই করতে লাগল। যে জন্তুর মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হত তা দেখতে পেলেই সে ছুটে গিয়ে সিংহকে বলত, 'বিরোচ সামি।' বোধিসত্ত্ব-সিংহ গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের কিনারায় এসে লাফিয়ে নিচের মাঠে চরতে থাকা জন্তুটির ঘাড়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলতেন। তারপর নিজে জন্তুটির মাংস খেতেন এবং শেয়ালকে দিতেন। শেয়াল এইভাবে বিনা পরিশ্রমেই খাবার পেয়ে যেত। গুহার এক কোণে ঘুমোতেও পেত সে।

ক্রমে সে বেশ মোটা-সোটা হল এবং তার দর্পও খুব বেড়ে গেল। সে ভাবতে শুরু করল, আমি সিংহের চেয়ে ছোট কিসে? আমারও তো সিংহেরই মত চারটে পা,—গায়েও বেশ জোর আছে। আমি এবার থেকে নিজেই সব জন্তু মেরে খাব। সিংহের ওপর ভরসা করে চলবার, তার দয়ার দান নেবার আমার দরকার নেই। আর সিংহ তো ঠিক নিজের জোরে হাতি-টাতি বড়-বড় জন্তু-জানোয়ারদের বধ করে না,—বধ করে আমার বলা মন্তরের জোরে; আমি যে 'বিরোচ সামি' মন্তরটা বলে চেঁচাই তাতেই সিংহের গায়ে হাতি মারবার মত অত ক্ষমতা আসে।

এইসব ভেবে শেয়াল সিংহের কাছে গিয়ে বলল, 'প্রভু, আপনি যে সব জন্তু মারেন আমি রোজ তারই মাংস খাই। এবার ভেবেছি আমি নিজেই একটা হাতি মেরে খাব। আপনি যদি সামান্য একটা কাজ করে দেন!'

'কী কাজ?' বোধিসত্ত্ব-সিংহ জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি গুহার যেখানে শুয়ে থাকেন আমি সেইখানে শুয়ে থাকব, আর আপনি গুহার বাহিরে ঘুরতে ঘুরতে নিচের মাঠে হাতি দেখতে পেলেই গুহার দরজায় এসে আমি যেমন বলি "বিরোচ সামি" ঠিক তেমনি করে আমায় বলবেন, "বিরোচ জম্বুক!" ' (তার মানে,—শেয়াল, তেজ দেখাও!)

শেয়ালের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব-সিংহ তো অবাক! শেয়াল বলে কী! হাতি মারবে! কী আজগুবি চিন্তা!

তিনি শেয়ালকে বুঝিয়ে বললেন, 'অমন কথা স্বপ্নেও ভেবো না! হাতি বধ করা সিংহেরই সম্ভব। আমি যে হাতি মারি তারই মাংস খেয়ে সন্তুষ্ট থাক।'

শেয়াল কিন্তু কিছুতেই তাঁর কথায় কান দিল না। 'আপনি আমার কথা-মতো "বিরোচ জম্বুক" বলেই দেখুন না'—এই বলে জিদ করতে লাগল।

অগত্যা বোধিসত্ত্ব-সিংহ শেয়ালের কথায় রাজি হলেন।

শেয়াল গুহায় ঢুকে বোধিসত্ত্বের জায়গায় শুয়ে রইল, আর তিনি পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে ঘুরতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা পাগলা হাতিকে দেখতে পেয়ে গুহার দরজায় গিয়ে শেয়ালের ইচ্ছা অনুযায়ী 'বিরোচ জম্বুক' বলে ডাক দিলেন।

শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে সিংহের নকল করে একটা হাই তুলে পাহাড়ের ধারে গিয়ে হাতিটাকে দেখল এবং সিংহনাদের কায়দায় বিকট এক চিৎকার করে হাতির ঘাড়ে পড়বার জন্য লাফ মারল। কিন্তু হাতির ঘাড়ে না পড়ে পড়ল হাতির চলার পথে। হাতিটা তখুনি তার থামের মত বিরাট ডান পা-টা দিয়ে শেয়ালের মাথাটা চেপে ধরল। ফলে শেয়ালের মুণ্ডটা গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গেল। শেয়ালের দর্প চূর্ণ হল।

অপরের কাজকে তুচ্ছ মনে করে নিজের সীমা ছাড়িয়ে বল বিদ্যা দেখাতে গেলে এমনি হয়।

ব্যোমকাকার গল্প শেষ হল।

টুনটুন্ বলল, 'কী মজার গল্প! আর একটা বলুন!'

'আর আজ নয়, কাজ আছে। অন্য একদিন আবার জাতকের গল্প শোনাবো তোদের।' ব্যোমকাকা চলে গেলেন।



অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশী ভূত পেত্নী তো আমরা হরদম দেখতে পাই, কিন্তু বিলাতী ভূত কি তেমনি দেখা যায়? যায় না। আমাদের দেশে যে সব সাহেব-মেম মা যায়, তারা কি ভূত হয়ে আবার নিজেদের দেশে চলে যায়? কিন্তু তা যাবার কথা নয়। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী রেলের কামরায় সাহেব-ভূত দেখার কথা তাঁর গল্পে লিখে গেছেন। তাঁর মতে সাহেব ভূতরা ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে করে ঘুরে বেড়ায়, খুশি হলে দেখা দেয়। আমাদের অফিসের গাব্বে সাহেবের মতে সাহেব-ভূত এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তবে তা সাহেবদের ভয় দেখাবার জন্যই। গাব্বে সাহেব বলে, 'সাহেবরা জ্যান্ত অবস্থায় এদেশের লোকদের ভয় দেখায়, আর মরলে পরে নিজের জাতের লোকদের ভয় দেখাতে তাদের আনন্দ।' অফিসের ছুটির পরে যখন আমরা দল বেঁধে গাছতলায় বসে টিফিন খেতাম তখন গাব্বে সাহেব পা ভাঁজ করে বসে আমাদের মাঝে মাঝে তার দেখা ভূতের গল্প শোনাত।

গাব্বে সাহেবের পুরো নাম যে কী ছিল, তা বিশ বছর অফিস করেও আমরা জানতাম না। জানবার কৌতূহলও হয়নি কখনো। গাব্বে কিন্তু সত্যি-সত্যিই সাদা চামড়ার সাহেব, আমাদের অফিসে বহুদিন থেকে কাজ করছিল। গাব্বের দুটো দোষের জন্যে অফিসের অন্যান্য সাহেবরা তার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করত না। সেই দুটো দোষের একটা হল তার চব্বিশ ঘণ্টা পান চিবোনো। আর দ্বিতীয় দোষ হল বাংলা বলা। পান সে গুণ্ডি দিয়ে উড়েদের মত সব সময় খেত, আর বাংলাটা বলত কলকাতার

মারোয়াড়িদের মত ; কিন্তু অফিসের কাজে ফাঁকি দেওয়া আর আড্ডা মারার ব্যাপারে সে ছিল খাঁটি বাঙালী। তার জামা-কাপড়ও বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত না, আর তার ছাঁটকাটও ছিল ঢিলেঢালা। এক কথায় বলা যেতে পারে যে কলকাতার কলের জল তার পেটে বেশ পরিমানে পড়েছিল, যার ফলে বাঙালীর যত দোষ তা সবই সে অতি সহজে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তাঁর মুখ দিয়ে সত্য কথাগুলি মিথ্যা বলে মনে হত, আর মিথ্যা কথাগুলি শুনলে মনে কোনরকম সন্দেহই হত না। আমরা যেবার স্বাধীনতা লাভ করি তার পরের বছরই গাব্বে সাহেব তাদের জাতভাইদের একটা দলের সঙ্গে ক্যানাডায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে আমি জানি না।

গাব্বে সাহেব গুণ্ডি দিয়ে একমুখ পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'সেবারে যখন সিমলায় যাই বেড়াতে, সেখানে আমাকে ভাই বড় নাজেহাল হতে হয়েছিল।'

কলকাতায় তুমুল বর্ষা নেমেছে। অফিসের কাজকম্মের শেষে জলের ঠেলায় আমাদের বাড়ি যাবার পথ বন্ধ। বসে বসে গাব্বের গল্প শুনছি। গাব্বে বলল, 'নাজেহাল বলে নাজেহাল! আমাকে একেবারে ল্যাজেগোবরে হতে হয়েছিল ভয়ের ঠেলায়।'

'ভয়! কিসের ভয়?' আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠলাম, 'তুমি তো প্রায়ই বল, বড়সাহেব ছাড়া তুমি ছুনিয়াতে কাউকে ভয় কর না।'

গাব্বে তার লাল দাঁত বের করে লজ্জার হাসি হাসল, বলল, 'সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু যাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম সে ছুনিয়ার বাইরের লোক।'

'ভূত?' আমরা সবাই স্থির হয়ে বসলাম।

'হাঁ বুট্‌।' গাব্বে চেয়ারের উপর পা ভাঁজ করে বাবু হয়ে বসে গোলগাল মুখে চোখছুটো আরও গোল করে তাকালো। আর সেইসঙ্গে বৃষ্টির প্রচণ্ড আওয়াজ চাপা দিয়ে অফিসের ধারে-কাছে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। গাব্বে একটু চমকে উঠে চোখে ভঙ্গি করে আমাদের দিকে চাইল ; ভাবটা যেন—দেখ আমার কথা সত্যি কি না!

আমাদের অফিসে চণ্ডী বসাক বলে একজন ক্যাশিয়ার ছিলেন। তাঁর

চেহারা যেমন রোগা তেমনি ছোট। গলার আওয়াজটাও ছিল ছুর্গাটুনটুনির মত। এমনিতে তিনি বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু কোন খুন-খারাবি কি ঐ রকম দুঃসাহসিক কাজের গল্প শুরু হলেই তিনি তাঁর টিনটিনে গলায় কিছু না কিছু জাহির করতেন। তাঁকে আমরা ডাকতাম পাগলা চণ্ডী বলে। গাব্বের ভূতের গল্প শুরু হতে না হতেই পাগলা চণ্ডী বলে উঠলেন, 'ভূত আমিও দেখেছি, কিন্তু গাব্বে, তোমার মত নাজেহাল বা ন্যাজেগোবরে হইনি। একবার একটা ফাঁকা বাড়িতে ভূত দেখে আমি তো তেড়ে মারতেই গিয়েছিলাম একটা লাঠি হাতে নিয়ে!'

গাব্বে পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'ক-ঘা মেরেছিলেন তাকে পাগলাবাবু? দো-তিন-চার?'

'না, মারতে পারিনি', পাগলা চণ্ডীবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'কাছে যেতেই কেন যেন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সেদিন আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল ছিল না। সকাল থেকেই পেটটা টিপ-টিপ করছিল। কিন্তু গাব্বে, তোমার মত একটা ভূত দেখেই আমি ভয় পাইনি।'

গাব্বে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'পাগলাবাবু, আমি একটা ভূত দেখিনি। একটা ভূত দেখলে আমিও তোমার মত লাঠি নিয়ে তেড়ে কাছে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। আমি এক রাত্তিরে পাঁচটা ভূত দেখেছি। তার মধ্যে পেত্নী ছিল, ভূত ছিল, আর ঐ গলা-কাটা না মাথা-কাটা তাও ছিল।'

আমরা বললাম, 'ওকে বলে স্কন্ধকাটা।'

'হাঁ হাঁ কান্নাকাটা, তাও ছিল। কিন্তু পাগলাবাবু, আমি ভয় পেয়েছিলাম বটে কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাইনি।'

হেড ক্যাশিয়ার ঘড়ি দেখলেন, তারপর চেয়ারে পা ছুটো তুলে বললেন, 'গাব্বে, এইবার আরম্ভ কর। আমরা সবাই জানি, তুমিও যেমন বীর চণ্ডীবাবুও তেমনি বীর। নাও, আর দেরি কোরো না।'

গাব্বে সাহেব পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে ডান হাতটা হেড ক্যাশিয়ার বাবুর দিকে লক্ষ্য করে কপালে ছোঁয়ালো, তারপর বলতে শুরু করল।

'সেবারে শিমলায় গিয়ে ভূত দেখার আগেই আমাকে ভূতে পেয়েছিল।

আমি গিয়েই ঝট করে একটা দামী গরম স্যুট করালাম, হাতে বোনা শাল আর কাঠের টুকিটাকি কিনলাম, তারপর ক-দিন সাহেবিয়ানা দেখিয়ে কাংড়া ভ্যালি ঘুরে যখন আবার ফিরে এলাম শিমলায়, তখন দেখি আমার পকেট প্রায় গড়ের মাঠ। হিসাব করে দেখলাম যা টাকাপয়সা আছে তাতে আর বড়জোর সাতটা দিন শিমলায় কাটাতে পারি। তাও ভাল হোটেলে থেকে নয়। ম্যালের ট্যাকসিওয়ালার দয়ায় আমি ছোট একটা সাদামাটা হোটেলের খোঁজ পেলাম। শহরের এক কোণে একটা পুরোনো বাড়ি, তার গায়ে লেখা হোটেলের সাইনবোর্ড না দেখলে ওটা যে একটা সরাইখানা তা মালুম হয় না। এ ধরনের শস্তার হোটেল সব শহরেই দেখতে পাওয়া যায়। হোটেলের ম্যানেজার একটা থুত্থুরে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। হোটেলটা যে শিমলা শহরের সেরা সে কথাটা সে তার মাড়ি দিয়ে আর জিভ দিয়ে নানারকম শব্দ করতে করতে বোঝাতে লাগল। তারপর দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজা খুলে আমাকে জিম্মা করে উধাও হয়ে গেল। বাড়িটা নির্জন, পুরোনো, ঘর আরও অন্ধকার। তবু রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার হাত থেকে রক্ষা পেলাম বলে মনে মনে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। দুপুরবেলাতে খেয়ে দেয়ে দরজা বন্ধ করে শহরে বের হলাম। গরমের দিনে শিমলা টাউনটা কী রকম ফার্স্ট ক্লাশ হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ?'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, 'না, দেখিনি। কিন্তু শিমলা টাউনের কথা তোমাকে বলতে হবে না, আমরা বই পড়ে জেনে নেব। তুমি ভূতের কথাই বল।'

গাব্বে বলল, 'সবটা শোন আগে। টাউনে টো টো করে, এর-ওর সঙ্গে দেখা করে আমার এক পিসির বাড়ি গেলাম। পিসি বহুকাল বাদে আমায় দেখতে পেয়ে মহা খুশি। সেইদিনই রাত্তির বেলায় আমাকে নেমন্তন্ন করে বসল। ঠিক করলাম হোটেলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নতুন স্যুটটা পরে বাবু হয়ে বের হব।

হোটেলের কাছে যখন গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দূর থেকে দু-একটা ঘরের আলো টিম-টিম করছে দেখতে পেলাম।

ম্যানেজারের ঘরে দেখলাম সে নেই। একটা বেয়ারাকে রাত্তিরে খাব না বলে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলাম। পুরানো কাঠের সিঁড়ি, উঠবার সময় ডব্-ডব্ আওয়াজ করতে লাগল।

ঘরে ঢুকে আমি সুইচ টিপলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, আলো জ্বলল না। অন্ধকারে হাতড়ে দেখি চারটে সুইচ পর-পর রয়েছে। সব কটা টেপার পর ইলেকট্রিক বালব্ জ্বলে উঠল বটে, কিন্তু সে যেন এক মোমবাতির টিমটিমে আলো। বুঝতে পারলাম যেমন হোটেল, তেমনি ম্যানেজার, আর তেমনি আলো। বাল্‌বের গায়ে ধুলো পড়ে জমে কালো হয়ে গিয়েছে।

এতক্ষণ বাল্‌বের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, আর ভাবছিলাম আলোটা যেমনভাবে দপ-দপ করছে তাতে কতক্ষণ টিকবে। আলোর দিক থেকে চোখ নামিয়ে ঘরের কোণে যেই তাকিয়েছি অমনি আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, একটি মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

হেড ক্যাশিয়ার বললেন, 'মেয়ে মানে মেমসাহেব?'

গাব্বে বলল, 'হ্যাঁ বড়বাবু, মেমসাহেব। তারপর আমি জেগে আছি কি স্বপ্ন দেখছি তাই ভাবতে ভাবতে তার দিকে তাকাতেই সে ঝট করে তার মাথাটা ঘাড় থেকে খুলে নিয়ে ডান হাতের উপর রাখল, আর মাথাটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।'

'সর্বনাশ!' হেড ক্যাশিয়ার বলে উঠলেন, 'তারপর?'

'আতঙ্কে কতক্ষণ যে আমি ওখানে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার মনে নেই। যখন হুঁস হল, তখন চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মরি কি পড়ি করে নিচে ছুটলাম। ছুটছিলাম আর দেখছিলাম আমার পিছনে কেউ তেড়ে আসছে কি না। হোটেলে বোধহয় তখন প্রায় লোকজন ছিল না, কারণ আমি যে চিৎকার করেছিলাম তাতে দমকল চলে আসে। সিঁড়ির পাশেই একটা ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছিল, আর সেই আলোর নিচে চারজন লোক দেখলাম তাস খেলছে। চিৎকার করতে করতে সেই ঘরে আমি ধড়াম করে ঢুকে পড়লাম।

তারা আমার অবস্থা দেখে কী হয়েছে কী হয়েছে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু আমি তখন ভয়ে কাঁপছি, মুখ দিয়ে প্রায় কথা বের হচ্ছে না। তাদের

মধ্যে একজন বুড়ো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছিল, সে চিবিয়ে চিবিয়ে আমায় বলল, 'কী হয়েছে আস্তে আস্তে খুলে বল। চেঁচামেচি কোরো না।'

বুড়োর ধমকানিতে আমার খানিকটা হুঁস এল। বললাম, 'আমি একটা ভয়ঙ্কর জিনিস দেখেছি, ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার!'

তারা বলল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার?'

আমি তাদের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা কাঁপতে কাঁপতে বললাম, কেমন করে আধা অন্ধকারে একটা মেয়ে তার নিজের মুণ্ডু ঘাড় থেকে খুলে হাতে নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সে কথা শুনে তারা হো হো করে গড়াগড়ি খেয়ে হাসতে লাগল। তাদের হাসি দেখে আমার তখন ভয়ের থেকে রাগ এসে গেছে। আমি রেগে বললাম, 'আপনারা হাসছেন কেন?' তারা হাসতে হাসতে বলল, 'হাসব না? ওতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে, ও তো সবাই পারে।'

তার পরেই, ভাই, দেখলাম সেই চারজনের কারো ঘাড়ে মাথা নেই। চারজনেরই মাথা তাদের হাতের মধ্যে। আর সেই হাতে রাখা মুণ্ডুগুলি আমার দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসছে।'

আমরা বললাম, 'তারপর কী হল?'

গাব্বে থামল। তারপর বলল, 'তার পরে আমি শুধু গেঞ্জি গায়ে চেঁচাতে চেঁচাতে প্রায় দুই কি তিন মাইল দৌড়েছিলাম বলে মনে পড়ে। তারপর পুলিশে আমায় ধরে মারধোর করে থানায় পুরে দেয়। তাদের মারধোরের ঠ্যালায় আমার ভয় ভাঙে। তারপর আমার শিমলার ঐ পিসির চেষ্টায় অনেক কষ্টে ছাড়া পাই।'

বল তো এ গল্পে কী ভুল আছে?

অর্চনদের একতলা বাড়িটা হল কলকাতার খুব অভিজাত অঞ্চলে। একদিন বিকেলে কলিং বেলের শব্দ পেয়ে অর্চন গিয়ে দরজা খুলে দেখে, তার পরম বন্ধু অতন্দ্র, যার সঙ্গে ঝগড়া না হলে আবার তার দিন কাটে না। অতন্দ্র বলল, 'ব্যাডমিন্টন খেলতে যাবি, অর্চন?'

খুশিতে ভরপুর হয়ে অর্চন বলল, 'সেই ভাল, চল্!' বলেই সে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ব্যাটটা নিয়ে এল। চলে গেল দুই বন্ধু ব্যাডমিন্টন খেলতে।

(উত্তর ৫৯ পৃষ্ঠায়)

খেলাধূলা

জাতীয় টেবল টেনিসের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার ফলাফল তোমাদের গত সপ্তাহে জানিয়েছি। তার কয়েকটি খেলা সম্বন্ধে এবার কিছু বলব।

এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উচ্চস্তরের খেলা হয়েছিল দিল্লী বনাম মহীশূরের ম্যাচে দিল্লীর দীপক ওয়াদেরার সঙ্গে কাবাদ জয়ন্তের খেলা। খেলাটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। মারের উপর মার—তার উপর আবার মার—এইভাবে চলেছিল। জয়ন্ত গত বছরের রানার-আপ,—তাঁকে টেবিলের কাছ থেকে সরাতে পারে এমন খেলোয়াড় যে ভারতে আছে এ ধারণা আমাদের ছিল না। কিন্তু দীপক তাই করলেন,—মারের পর মারে পর্যুদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ন্তকে পেছিয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়। একটা গেম হেরে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেন ওয়াদেরা।

এ ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা হয়েছিল মহারাষ্ট্র বনাম মহীশূরের ম্যাচে সুহাস কুলকার্নির সঙ্গে জয়ন্তের খেলা। দু-জনেই একটা করে গেম পেয়েছেন, তৃতীয় গেমে সুহাস ১৪-৫ পয়েন্ট এগিয়ে,—সেই অবস্থায় জয়ন্ত অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে সেই গেম জেতেন।

আর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা হল অন্ধ্র বনাম মহারাষ্ট্রের ম্যাচে অন্ধ্রর মীরকাশিম আলির সঙ্গে মন্টি মার্চেন্টের খেলা। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর গত বছরের বিজয়ী মীরকাশিমকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

আর একটা খেলার উল্লেখ করতেই হয়, খেলার মানের দিক দিয়ে না হোক গুরুত্বের দিক দিয়ে, এবং অভাবনীয় ফলাফলের জন্যে। দিল্লীর সঙ্গে রেল দলের ম্যাচে কে ভেবেছিল ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি রেলের জগন্নাথ বেদীর কাছে হেরে যাবেন! জগন্নাথের তুলনায় অনেক নিম্ন মানের খেলোয়াড় বেদী; কিন্তু যেভাবে জগন্নাথ সরাসরি দু-গেমে বেদীর মারের কাছে পরাজিত হলেন, সে এক পরম বিস্ময়। অথচ সেই একই ম্যাচে জগন্নাথ দিল্লীর সেরা খেলোয়াড় ওয়াদেরাকে পরাজিত করেন। ঐ খেলায় জিতলে রেল দলের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হবার সুবর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

এ বছর পুরুষদের খেলার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে, কোন খেলোয়াড়ই অপরাজিত থাকেন নি।

মহিলাদের খেলা সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। মহারাষ্ট্র 'এ' দলের কেইট চার্জম্যান (গত বছরের বিজয়ী) অন্য সকলের খেলা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তাঁর খেলা দেখে মনে হয় না আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে কেউ তাঁকে হারাতে পারবেন। কেইটির সমান মহিলা খেলোয়াড় আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয়নি—এ কথা জোর করেই বলা যায়।

মহিলাদের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় এবার বাংলার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কারণ মহারাষ্ট্র 'এ'-র দু-নম্বর খেলোয়াড় উষা মুকুন্দ না আসায় তাদের দল ছিল অনেকটা দুর্বল। আর-আর ভাল দলের মধ্যেও একজন করে দুর্বল খেলোয়াড় ছিল। সেদিক দিয়ে বাংলার সুবিধে ছিল এই যে, রূপা আর ইন্দু দুজনেই ভাল খেলেন। মহারাষ্ট্র 'এ' দলের সঙ্গে ডাবল্‌সের খেলায় যদি রূপা আর ইন্দু জিততে পারতেন তাহলে বাংলার জয় সুনিশ্চিত ছিল, কারণ চূড়ান্ত খেলায় গীতা নাদকার্নি কোনমতেই রূপার সঙ্গে পারতেন না ; ফলে বাংলা যেখানে ৩-১ ম্যাচে হেরেছে সেখানে ৩-২ ম্যাচে জিতে যেত। ডাবল্‌স্ খেলাটায় বাংলা একটুর জন্যে হেরে যায়।

বালকদের খেলার জৌলুস এ বছর যেন একটু কম,—তবে বিজয়ী বালচন্দ্রনের খেলা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

পুরুষদের সিঙ্গল্‌সে জগন্নাথের জয়লাভ খানিকটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, যদিও অবশ্য তার দিন-দুই আগেও তিনি ইন্টার-অ্যাসোসিয়েশনের খেলায় মীরকাশিমকে হারিয়েছিলেন। প্রথম গেমে মীরকাশিম যেভাবে খেলছিলেন তাতে বরং মনে হচ্ছিল তিনি সহজেই জিতে যাবেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ২০-১৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেই গেমও তিনি হেরে গেলেন। পরের গেমে তিনি একেবারেই খেলতে পারেন নি। তৃতীয় গেমেও মীরকাশিম অনেকটা এগিয়ে ছিলেন,—১৬-১১। সে গেমটাও তিনি অদ্ভুত খারাপ খেলে হেরে গেলেন। জাতীয় প্রতিযোগিতার প্রথম দু-বছরের বিজয়ী মহম্মদ আয়ুব, আর থিরুভেঙ্কদম্-এর পর জগন্নাথ হলেন তৃতীয়

ডিফেন্‌সিভ খেলোয়াড় যিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ জয় করলেন। ফাইন্যাল খেলার মান একেবারেই উচ্চস্তরের হয় নি।

ভারত বনাম জাপান টেস্ট খেলাগুলোয় ভারত একটা খেলায় জিতেছে, আর দুটো খেলায় ৫-২ ও ৫-১ ম্যাচে হেরে বাকিগুলো ৫-০ ম্যাচে হেরেছে। কিন্তু ঐ একটা টেস্ট-এ জেতাটাই রীতিমত বাহাদুরি বলতে হবে। সে খেলায় কোনো-র অসুস্থতার জন্যে জাপানকে তিনটে পয়েন্ট ওয়াক ওভার দিতে হয়েছিল, অর্থাৎ মাত্র দুটো খেলায় জিতলেই ভারতের জয় হবে। সুতরাং বলা বাহুল্য এ প্রতিযোগিতায় জাপানকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে খেলতে হয়েছে, এবং তা সত্ত্বেও দুটো খেলায় হেরে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। জাপানের সঙ্গে খেলা দেখে মনে হচ্ছে ভারতের খেলার অনেকটা উন্নতি হয়েছে এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারত আগের থেকে ভালই খেলবে।

এবার ক্রিকেট। ইংলিশ স্কুলের সঙ্গে ভারতীয় স্কুলের যে 'টেস্ট' খেলা শেষ হল তার খবর নিশ্চয় তোমরা পেয়েছ। ভারত একটায় জয়ী হয়েছে, আর বাকিগুলো ড্র হয়েছে।

ফুটবলে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের জয়লাভের খবর তোমরা পেয়েছ। ইতিপূর্বে আই. এফ্. এ-তে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানেরই প্রাধান্য দেখা গেছে; আর ডুরাণ্ডের খেলায় এ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ওরাই ফাইন্যাল খেলবে। ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতায় গত দশ বছরের মধ্যে বাংলার দলগুলিরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। ফুটবলে আজও বাংলা ভারতে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাডমিন্টনের জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে গত বছরের বিজয়ী দীপু ঘোষ তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশ গোয়েলের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর খুব সামান্যর জন্যে হেরে গেছেন। টেবল টেনিসে মীরকাশিমের আর ব্যাডমিন্টনে দীপুর পরাজয়ে গত বছরের দু-জন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের পরাজয় ঘটল।

জাতীয় টেনিসের ফাইন্যালে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এক নম্বর খেলোয়াড় ও চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিত লালকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু ওঁদের দুজনেরই খেলা পড়তির দিকে, তাই এ ফলাফল আমাদের বিশেষ আকর্ষণ করে না।

আমাদের দৃষ্টি এখন তরুণদের দিকে। যতদিন তারা জয়দীপ প্রেমজিতের কাছে হারতে থাকবে ততদিন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

'খেলা শেখা' বিভাগ কোন্ খেলা দিয়ে শুরু হবে—এ বিষয়ে গত সপ্তাহে তোমাদের ভোট দিতে বলেছিলাম। সেই ভোটে টেবল টেনিস প্রথম হওয়ায় আগামী সংখ্যা থেকে টেবল টেনিস খেলা শেখানো হবে।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেস্ট এখন পুরো দমে চলেছে। সমস্ত খেলা শেষ হলে ও সম্বন্ধে লিখব।

গল্পের ভুলের উত্তর: অর্চনরা একতলা বাড়িতে থাকত; সিঁড়ি বেয়ে উঠে ব্যাট আনবে কেন?

মজার অঙ্ক

১৯৮, ১০৮৯

দশের নিচের যে-কোন তিনটি সংখ্যা ধর। সংখ্যাগুলো কিন্তু পর-পর হওয়া চাই, আর নিচের দিকে। যথা—৩, ২, ১

	৩ ২ ১
সংখ্যাগুলো উল্টে নাও	১ ২ ৩
বিয়োগ কর, উত্তরটা সর্বদাই হবে	১ ৯ ৮
	১ ৯ ৮
আবার সংখ্যাগুলো উল্টে নাও	৮ ৯ ১
যোগ কর, উত্তরটা সর্বদাই হবে	১ ০ ৮ ৯

এইভাবে পর-পর নিম্নমুখী অন্য যে-কোন তিনটি সংখ্যা নিয়ে দেখ, সেই একই উত্তর হবে— ১ ৯ ৮ আর ১ ০ ৮ ৯।

মন্দিরের জ্বর

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

খুকু আমার হাতের আঙুল ধরে বেড়াচ্ছিল আর থেকে-থেকে ঝিনুক কুড়োচ্ছিল, হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল,—'মালা, এই মালা! এই ছাখ্ আমি কত ঝিনুক কুড়িয়েছি!'

'আমিও, এই ছাখ্! তোর চেয়ে ঢের বেশি!'

খুকুর বন্ধু মালা তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল, আমার আগেই খুকু তাকে দেখতে পেয়েছে; আর পাছে মালা তাকে ছোট মেয়ে মনে করে তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার আঙুলটা ছেড়ে দিয়েছে। তা, খুকুই বা হার মানবে কেন? মালার এ কথার উত্তরে একমাথা চুল ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'ইস! আমার চেয়ে বেশি আর কুড়োতে হয় না! দিদি কী বলেছে জানিস! বলেছে, একশোটা ঝিনুক কুড়োতে পারলে আমায় একটা খুব সুন্দর খেলনা তৈরি করে দেবে! তোর অমন দিদি আছে?'

'না থাকুক! জানিস, আমার মা আমায় কত ভালবাসে, বলেছে কলকাতায় গিয়ে আমায় একটা দম-দেওয়া মোটর-গাড়ি কিনে দিবে!'

'জানি! ও তো মোটর গাড়ি! আমার বাবু না, আমার জন্মদিনে আমায় একটা রেলগাড়ি কিনে দিয়েছিল,—তার আবার কেমন লাইন আছে! দম দিলেই সেই লাইনের উপর দিয়ে বন্-বন্ করে ঘোরে! সে তুই দেখিস নি কখনো!'

'যা যাঃ, ভারি তো! পারবে তোর রেলগাড়ি আমার মোটরের সঙ্গে দৌড়ে? আয়, দৌড়বি আমার সঙ্গে!'

'হ্যাঁ দৌড়ব!'

তখনই ওদের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়ে গেল। মালার বাবা খানিকটা দূরে চলে গেলেন, আর আমি ওদের দুজনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওয়ান, টু, থ্রী বলতেই সঙ্গে সঙ্গে ওরা সেই আলগা বালির উপর দিয়ে দিব্যি মালার বাবার দিকে দৌড়তে লাগল।

'ফার্স্ট, আমি ফার্স্ট! এ মা, শুক্তি হেরে গেল!'

'ইঃ, কক্ষনো আমি হেরে যাই নি!'

'জিজ্ঞেস কর বাবুকে! ও বাবু, আমি আগে আসি নি?'

মালার বাবা বললেন, 'বাঃ, দুজনেই খুব ভাল দৌড়েছ।'

কিন্তু মালা তাতে সন্তুষ্ট হবে কেন? সে যে সত্যিই আগে এসেছে। বলল, 'তাহলেও আমি তো আগে এসেছি, আমি ফার্স্ট, ব্যস!'

'না, আমি ফার্স্ট! নিশ্চয় ফার্স্ট, ব্যস!'

'আমি আগে এসেছি, আমি আগে ফার্স্ট!'

'তবে আমি পরে ফার্স্ট, ব্যস্!'

'আচ্ছা।'

ওদের মীমাংসা হয়ে গেল। খুকুকে বললাম, 'চল্ এবার ঘরে ফিরে যাই, চা-খাবার খেয়ে স্নান করতে আসব।'

যাবার আগে মালার দিকে ফিরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে খুকু বলল, 'মালা, মনে আছে তো? মন্দির?'

'নিশ্চয়! কাউকে বলবি না কিন্তু!'

'আচ্ছা।'

ফেরার পথে খুকু বলল, 'ও বাবু, আমার আজ খুব শীত করছে, আজ আমি সমুদ্দুরে নাইব না!'

'দূর বোকা, সমুদ্রে নাইলে একটুও শীত করে না।'

উত্তরটা খুকুর পছন্দ হল না। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে চলতে লাগল। খানিকটা গিয়ে বলল, 'ও বাবু, তখন তো আমার খুব শীত করছিল, এখন খুব গরম হচ্ছে!'

বুঝলাম আজ ওকে রাজি করানো কঠিন হবে। বললাম—'আচ্ছা, আজ তাহলে না হয় হোটেলেই নাইবি।'

খুকুকে হোটেলে রেখে আমরা সকলে স্নান করতে গেলাম। ফিরে যখন আসছি তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। দেখি হোটেলের ঘেরা পাঁচিলের কাছে সেখানে বালি আছে, খুকু আর মালা সেখানে রোদে বসে মন্দির তৈরি করছে। খুকুর একটা কথা কানে এল :—'এই মালা! মন্দিরের অর হয়েছে!'

কথাটা বোধহয় মালার ঠিক বিশ্বাস হল না ; সে একটু ভেবে নিয়ে বলল,—'যাঃ, মন্দিরের কখনো জ্বর হয় ?'

'না, হয় না আবার ! এই খ্যাখ্ না, গা কেমন গরম !'

মন্দিরে হাত বুলিয়ে মালা বলে উঠল, 'হ্যাঁ রে, তাই তো ! আহা, গা-টা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে !'

খুকু বলল, 'চল্ থারমিটার নিয়ে আসি !'

'দূর বোকা, থারমিটার তো বগলে দেয় ; মন্দিরের কি বগল আছে ?'

'মুখেও দেয় মশাই, তুমি জান কী ! দাদুর অসুখের সময় মুখে দিয়েছিল, আমি দেখেছি ।'

'মন্দিরের তো মুখও নেই, তবে কী করবি ?'

'তবে আয় এক কাজ করি, জলপটি দিই ।' এই বলে খুকু আর মালা মতামতের অপেক্ষা না রেখে কোত্থেকে একটা জবজবে ভিজে ন্যাকড়া এনে মন্দিরের উপর জড়িয়ে দিল । ফলে যা হবার তাই হল । সেদিন ওদের কান্না থামাতে আমায় অনেক বেগ পেতে হয়েছিল ।

---

* * *

শিশির । শুনেছি মাছেরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে ।

মিহির । ঠিকই শুনেছ । আমাদের হাবুদা গত বছর একটা মাছ ধরেছিল । সেই থেকে যতবার সে মাছটার সাইজের কথা বলেছে ততবার সেটা বেড়ে উঠেছে ।

* * *

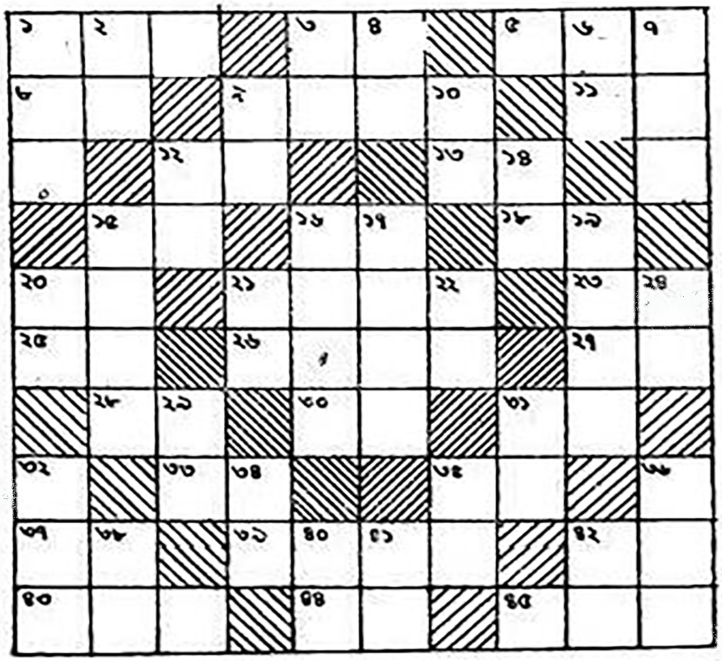
খুকু । না, আমি আর শেষদিন ইস্কুলে যাব না !

মা । কেন রে ?

খুকু । দিদিমনি না, কী বোকা, কিচ্ছু জানে না ! একদিন বলল চারে আর চারে আট হয়, একদিন বলল পাঁচে আর তিনে আট হয় । আবার আজ কী বলল জান ? বলল ছয়ে আর দুয়ে আট হয় । ও আগে বলুক কোন্‌টা ঠিক, তবে ইস্কুলে যাব !

শব্দচৌকি

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়



সঙ্কেত-সূত্র

পাশাপাশি : ১. একটি নদ ৩. মহাভারতের আচার্য ৫. আমার দেশ, তোমার দেশ ৮. নোঙরা বড়, পায়েও বাজে ৯. এই রাজার তিন রানী, চার ছেলে ১১. রাম যেখানে গিয়েছিলেন ১২. খেলে বেশ লাগে ১৩. শিরা ১৫. ভারতের পুরাতন মুদ্রা ১৬. আমি—, তুমি হও ১৮. মোগল সম্রাটের বড় ছেলে ২০. কথায় বলে ধার্মিক, মিটমিটে শয়তান ২১. শ্রীকৃষ্ণের কত নাম ? ২৩. মারতে হলে দু-হাতই যথেষ্ট, কামানের দরকার নেই ২৫. ভরতের ভাইপো ২৬. পদ্ম ২৭. —ও ভাল, কাটলেটও ভাল ২৮. ফলের যা খায় ৩০. সবুজ মাঠ (ইং) কিংবা সুতির কাপড় ৩১. রাবণের ছেলের কাছেও যুদ্ধে পরাজিত ৩৩. ছল ৩৫. আলালেই

আলো ৩৭. চতুষ্পদ জন্তু ৩৯. বড়মানুষি দেখাতে গেলে এর কোট, প্যান্ট, শার্ট দরকার ৪২. দুটি স্বরগ্রাম ৪৩. উলটিয়ে নিলেই থাকল, নয় তো নয় ৪৪. পিঠে ৪৫, সরস্বতী।

উপর থেকে নিচ : ১. মৃত্যু নেই ২. পানীয় ৩. রোগা ৪. আপন নয় ৬. সোজাসুজি শব্দ, উল্টে গেলে শালীর কাছে জব্দ ৭. ছেলে ৯. দাম ১০. মরুভূমি ১২. নিষেধ ১৪. দুর্যোধনের হাতিয়ার ১৫. মোগল সম্রাট ১৬. শক্তিক্ষয় ১৭. সাজিয়ে নিলে রাসায়নিক সুতো ১৯. যিনি না হলে রামায়ণ লেখা হত না ২০. ব্যাটের বন্ধু ২১. উলটিয়ে নিলে কৌশল্যার নাতি ২২. বিশ্বকর্মার সমান খ্যাত দৈত্য ২৪. অভিসম্পাত ২৯. অনেক লোকের মেলা ৩১. শেষ ৩২. সাঙ্ঘাতিক পাখি ৩৪. শাক, মুড়োলেই শেষ ৩৫. বন্যা ৩৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের গল্পের সর্বপ্রিয় চরিত্র ৩৮. মাছ ৪০. শত্রু ৪১. ইংরেজি পদ্ম ৪৩. এ না থাকলে ভোঁতা।

শব্দচৌকির উত্তর

পাশাপাশি : ১. অজয় ৩. কূপ ৫. ভারত ৮. মল ৯. দশরথ ১১. বন ১২. মার ১৩. রগ ১৫. আঁনা ১৬. হই ১৮. দারা ২০. বক ২১. শতনাম ২৩. মশা ২৫. লব ১৬. কুবলয় ২৭. চপ ২৮. রস ৩০. লন ৩১. ইন্দ্র ৩৩. ভান ৩৫. বাতি ৩৭. গরু ৩৯. টেরিলিন ৪২. ধানি ৪৩. লইর ৪৪. পুলি ৪৫. সারদা।

উপর থেকে নিচ : ১. অমর ২. জল ৩. কৃশ ৪. পর ৬. রব ৭. তনয় ৯. দর ১০. থর ১২. মানা ১৪. গদা ১৫. আকবর ১৬. হৃতবল ১৭. ইনালন ১৯. রামচন্দ্র ২০. বল ২১. শঙ্কু ২২. ময় ২৪. শাপ ২৯. সভা ৩১. ইতি ৩২. ঈগল ৩৪. নাটে ৩৫. বান ৩৬. টেনিদা ৩৮. রুই ৪০, রিপু ৪২. ধার